দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা কলাম

02

স্কুল পরিক্রমা

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল। ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহী এ স্কুলটির নাম কারও অজানা নয়। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও ঢাকা শহরের সেরা স্কুল বলতে ল্যাবরেটরী স্কুলকেই বোঝাত। আজ এর পাশাপাশি বেশ কিছু ভাল স্কুল গড়ে উঠলেও এ স্কুলের ঐতিহ্য এখনও কমেনি। তবে একেবারেই কমেনি, তা বলা ঠিক হবে না। কারণ ইদানীং এ স্কুলের পড়াশোনার মান সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন উঠছে, যদিও প্রতিবছরই এসএসসি পরীক্ষায় স্কুলের রেজাল্ট ভাল হচ্ছে। আসলে ভাল জিনিসের অল্প খারাপই চোখে অনেক বেশি হয়ে ধরা পড়ে। পড়াশোর পাশাপাশি স্কুল বিল্ডিংয়ে দৈন্য অবস্থাও চোখে পড়ল। বিল্ডিংটি যথেষ্ট পুরনো হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের কোন দৃষ্টি নেই বলেই মনে হলো। অতিরিক্ত ছাত্রের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলাও চোখে পড়ল। যা হোক, কিছুটা হতাশা নিয়েই স্কুলের পড়াশোনার পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগ্রহে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করি। পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে তা বর্ণিত হলো।

বছরের শুরুতে অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু প্রায় সারা মাস ধরে ভর্তি কার্যক্রম চলায় এ মাসটাতে ততটা সিরিয়াসলি ক্লাস হয় না। ফলে এ সময়ে স্কুলের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো, —যেমন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মিলাদ ইত্যাদি শেষ করা হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে সিরিয়াসলি পড়ালেখা শুরু হয়।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে প্রত্যেক ছাত্রকে সিলেবাস এবং বুক লিস্ট দেয়া হয়। সিলেবাসে পুরো বছরের পাঠ্যসূচী দেয়া থাকে। সিলেবাসকে পরীক্ষানুযায়ী দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। সিলেবাস দেয়ার কারণ হচ্ছে, সারা বছর একজন ছাত্রকে কি পড়তে হবে সে ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক প্রত্যেকেই সচেতন থাকেন। বছরের স্বাভাবিকভাবে অনেক ছুটি থাকে এবং রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সিলেবাস অনেক সময় শেষ করা সম্ভব হয় না। কাজেই সিলেবাস দেয়া থাকলে ছাত্রদের সুবিধা হয়।

বাড়ির কাজের জন্য আলাদা কোন নোট বই দেয়া হয় না। ক্লাসে শিক্ষক যা পড়ান, পরের দিন সে বিষয়ের ওপর পাঁচ-দশ মিনিট প্রশ্ন করা হয়। ফলে ক্লাসে যেমন প্রচণ্ড মনোযোগ দিতে হয় অন্যদিকে বাসায়ও ভালভাবে পড়তে হয় পরের দিনের প্রস্তুতির জন্য। এতে পড়াটা ভালভাবে হয়ে যায়।

পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী : বছরে দু'টি পরীক্ষা হয়। হাফইয়ার্লি এবং ফাইনাল। প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। পাস নম্বর ৩৩।

শ্রেণী পরীক্ষা নেয়া হয় কিন্তু এ ব্যাপারে অফিসিয়ালি কোন নির্দেশ নেই বা বাধ্যবাধকতা নেই। সাধারণত উপরের ক্লাসগুলোতেই শ্রেণী পরীক্ষা নেয়া হয়। একজন শিক্ষক তাঁর বিষয়ের ওপর প্রয়োজন মনে করলেই পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সিলেবাস শেষ করার পরই পরীক্ষা নেয়া হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই পরীক্ষা নেয়া হয়। যেমন ইংরেজী

অদিতি রহমান

দ্বিতীয় পত্রের কথাই ধরা যাক। সিলেবাস অনুযায়ী Essay, Letter, Paragraph এবং গ্রামার ইত্যাদি সবকিছু পড়া শেষ করানোর পর একদিন হয়ত Essay, অন্য দিন Letter, এ ভাবে প্রতিটি বিষয়েই প্রয়োজনানুসারে শিক্ষকরা নিজেদের মতো করে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই পরীক্ষার কোন নম্বর মূল পরীক্ষায় যোগ হয় না।

এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি : এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কোন রকম কোচিংয়ের ব্যবস্থা নেই। সরকারী স্কুলগুলোতে কোচিংয়ের ব্যবস্থা থাকে না।

বৃত্তি পরীক্ষা : বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের আলাদাভাবে গাইড দেয়া হয়। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে তিনটি সেকশন আছে। প্রতিটি সেকশনে ৬০/৭০ জন করে ছাত্র। প্রতিটি সেকশন থেকে প্রথম ২০ জনকে বাছাই করে ৬০ জনের একটি সেকশন করা হয়। তাদেরকে প্রথম থেকেই বিশেষ পদ্ধতিতে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। বেসরকারী স্কুলগুলো থেকে সরকারী স্কুলে পড়াশোনার পদ্ধতি হালকা এবং খুব একটা উন্নতমানের মনে না হওয়ায় এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বেশ কিছু কথা বলেন। প্রথমেই তিনি জানান, আমাদের হাত-পা বাঁধা। অর্থাৎ সরকারী প্রতিটি স্কুলের সবদিক থেকে একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। স্কুলের কোন ব্যাপারেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ডিসিশন নিতে পারেন না। সবকিছুই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। একজন শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে একজন দারোয়ান পর্যন্ত সরকারীভাবে নিয়োগ করা হয়। কোন রকম নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা আমাদের নেই। ফলে অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও আমরা তা করতে পারি না।

বর্তমানে আমাদের স্কুলে নানা রকম সমস্যা রয়েছে। যেমন—শিক্ষক স্বল্পতা, অফিস স্টাফ স্বল্পতা, ক্লাস রুমের অভাব এবং অতিরিক্ত ছাত্রের চাপ।

শিক্ষক স্বল্পতা আমাদের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। একজন শিক্ষককে প্রতিদিন সাতটি ক্লাস নিতে হয়। এতগুলো ক্লাস নেয়ার পর একজন শিক্ষকের পক্ষে ক্লাস টেস্ট নিয়ে খাতা দেখা সত্যিই কষ্টকর ব্যাপার। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে আমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরও কোচিং করাতে পারছি না। রয়েছে ক্লাসরুমের অভাব। এ ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—অর্থনৈতিক বিষয়। অর্থাৎ আমরা স্কুলের কোন কাজে কিংবা ছাত্রদের কোন স্বার্থে কারও কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না। স্কুলের কোন বিষয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য চাঁদা নিতে গেলেও আমাদের অনেক রকম সমস্যা হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি টাকা নিয়ে পরীক্ষার্থী কিংবা দুর্বল ছাত্রদের কোচিং করাই, তাহলে পরদিন আপনারাই পত্রিকায় ছাপাবেন যে, অমুক স্কুল কোচিংয়ের নামে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। তো বুঝতেই পারছেন, আমাদের সীমাবদ্ধতা। অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যাও আমাদের এখন বিরাট সমস্যা। প্রতিটি ক্লাসেই দু'-তিনটি সেকশন আছে এবং প্রতিটি সেকশনেই ৭০/৮০ জন করে ছাত্র। এ ছাড়াও রয়েছে দু'শিফ্‌ট। এত ছাত্রকে অল্প কয়েকজন শিক্ষকের পক্ষে ম্যানেজ করা দুরূহ ব্যাপার। ফলে ইদানীং আমাদের স্কুলে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র ভর্তিতে নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা থাকলেও প্রতিবছরই উপরের চাপে বাড়তি ছাত্র ভর্তি করতে হয়।

যা হোক, এতসব সমস্যার পরও আমরা আন্তরিকতার সাথে ছাত্রদের সুশিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করছি। ফলে প্রতিবছরই এসএসসি পরীক্ষায় আমাদের ছাত্ররা অত্যন্ত ভাল ফল করে সুন্দর ভবিষ্যতে পা বাড়াচ্ছে।